গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

দীপাবলির আলোকে দূরীভূত হয় সকল অমঙ্গল ও অশুভ শক্তি। ভারতের সর্বস্তরের মানুষ এই দীপাবলির দিনটি খুব ধুমধাম সহকারে পালন করে। তবে শুধু ভারতেই নয়, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ফিজিতেও এই দিন এক আনন্দের আমেজ বিরাজ করে। তবে এই আলোর আতস বাজির উৎসব শুধু যদি দীপের উৎসব হত, তাহলে কি খুব মন্দ হত! এখন তো পরিবেশ দূষক বাতির বিকল্প হিসাবে বৈদ্যুতিক দীপগুলিও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে...

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৪, সংখ্যা ৫

অক্টোবর ২০২২

আলোর দীপ সংখ্যা

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী, সমীর দাস, গোবিন্দ মোদক, চৈতি চক্রবর্তী, অনির্বাণ বিশ্বাস, রাজশ্রী দত্ত এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

@Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

গতবারের সংখ্যায় আমাদের 'গুঞ্জন' পত্রিকার তরফ থেকে একটি ই-বুক প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে পুরানো লেখক-লেখিকাদের সাথে সাথে পাশে পেয়েছি নতুন লেখক ও লেখিকাদের। এই ক'দিনের মধ্যেই এই বিশেষ শারদীয়া সংখ্যাটি পাঠক মহলে বেশ সাড়া ফেলেছে। দেশ-বিদেশ থেকে বহু পাঠকরা গুঞ্জনে প্রকাশিত লেখাগুলির বেশ প্রশংসা করেছেন। নতুন নতুন লেখক-লেখিকাদের পাঠকের দরবারে এইভাবে পৌঁছে দিতে পেরে আমরা আন্তরিকভাবে সত্যি আপ্লুত।

অনেকেই জানতে চেয়েছেন গুঞ্জনকে কবে কাগজের দুই মলাটে দেখতে পাবেন? আমরা জানি বই একটি মহামূল্যবান সম্পদ। তাই সকলের এই আবেগ ও অপেক্ষার যথাযথ সম্মান দেওয়ার জন্য আমরা সত্বরই ছাপার অক্ষরে বই প্রকাশের চেষ্টা করব। তবে আপাতত আমরা ই-পত্রিকা ও ই-বুক আকারেই লেখা প্রকাশ করছি ও করব।

আপনাদের সকলের দীপাবলি খুব ভালভাবে কাটুক। দূষণে পথ পরিত্যাগ করে, দীপের আলোয় ভরে উঠুক সকলের জীবন। 'পাণ্ডুলিপি'-র পক্ষ থেকে সকলকে জানাই শুভ দীপাবলির আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ■

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন
বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

কালী মাতা

ॐ क्रीं कालिकायै नमः

কলম হাতে

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ বাংলার নারী...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১৩ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কালের মা কালী

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি।

...রামপ্রাসাদী শ্যামাগীতি

মুক্তকেশীর হাতেই সর্বকালের সকল ব্যাথার নিরশন। মুক্তকেশী হলেন কালিকা শক্তি। ‘কাল’ হলেন ‘মহাকাল’ আর ‘কালী’ বা ‘কালিকা’ হলেন ত্রিকাল-মহেশ্বরের আদ্যাশক্তি। মুক্তকেশী আদ্যাশক্তির কৃপায় কেটে যায় সমস্ত বিরোধ গ্রহের কুপ্রভাব। শক্তি সঞ্চয়কারিনী কালিকা মা সকল রোগ, ভোগ, শোক, ভয় ও দুঃখ নিবারণ করে আত্ম-শুদ্ধির ও আত্ম-মুক্তির পথের সন্ধান দেন।

জ্ঞানাতীত আদ্যাশক্তির সাধন কেন্দ্রবিন্দু ‘আধ্যাত্ম্য জগৎ’ হিসাবে বিবেচ্য হলেও বিজ্ঞানের আঙ্গিকেও এই কালিকা আদ্যাশক্তির অধিষ্ঠান বহু যুগ আগে থেকেই। বিজ্ঞানের আধারে কালীকে যদি কল্পনা শক্তির উৎস হিসাবে পরিগণিত করা হয়, তাহলে বলা যায় — বিশ্ব সৃষ্টির আদি পর্বে অনন্ত ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাণ্ড ছিল নিকষ কালো আঁধারে নিমজ্জিত – একবারে নিশ্ছিদ্র তমসার অনন্ত ধ্যানগম্ভীর রহস্যে আবৃত। এক ছিটে-ফোঁটা আলোর ছোঁয়া ছিল না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে চরাচরে ছিল শুধুই কৃষ্ণবর্ণা কালীর একছত্র অধিষ্ঠান। সকল যুক্তি সেই কালোর মহিমায় ধর্ম ও বিজ্ঞানের এক অবিশ্বাস্য

মেলবন্ধন ঘটিয়েছে, যা বাহ্য জ্ঞানের কল্পনাতীত।

বিজ্ঞানের ‘বিগ ব্যাংগ তত্ত্ব’ অনুযায়ী কাল বা সময় যখন সৃষ্টি হয়, তখন থেকেই এটাও নির্ধারিত যে, এই কালের লয় বা বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। সনাতন হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী, কালিকা শক্তি হল সংহারের প্রতিভূ। তিনি সর্বকালের সীমারেখা নির্ধারণকারিনী। তাই দেবী সেই সংহারকারী রূপে মহাকালের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র আধার। এছাড়া বিজ্ঞানের পরিভাষায় সৃষ্টির আদি লগ্নে মহাবিশ্বের যে ভয়াল ভীষণ বিভীষিকাময় রূপের বর্ণনা পেয়ে থাকি, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা করে বলা যায়, প্রবল সংহারে অর্থাৎ গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু ও মহাজাগতিক রশ্মির প্রবল বিস্ফোরণের পর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি।

একবিংশ শতাব্দীর যুগে এসেও তাই এই তত্ত্ব কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না যে, সৃষ্টির প্রতিটা অনু পরমাণু থেকে শুরু করে ক্রমবিকাশের পদে পদে জগজ্জননী কালিকা মা প্রবল সংহারের মধ্যে দিয়ে তাঁর সৃষ্টির করুণাময়ী কৃপার বর্ষণ করে চলেছেন অহরহ। তাই বলা বাহুল্য, জ্ঞানে-অজ্ঞানে কিংবা বিজ্ঞানের আধারে সকল যম-যাতনা সংহারকারী বা হরণকারী কাল ভৈরবী, সর্বশক্তির এক ও অদ্বিতীয়া হলেন মা কালিকা। তাই আজও রামপ্রাসাদী সুরে মাতোয়ারা হয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয় বারংবার —

“ডুব দে রে মন কালী ব’লে

..হৃদে-রত্নাকরের অগাধ জলে।।” ■

ঘাটশিলার কবিতা

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

লালটা লালই থাকুক
সবুজটা সবুজ
ভালোবাসার মনটা
যেন চিরদিনই থাকে অবুঝ...

বাতাস দিলে একটু দোলা
মন যেন না মুখ ফেরায়
ভালোবাসা বাড়ুক শুধু
সে যেন না পথ হারায়...

বিলাসবহুল জীবনধারা
তার ফাঁকেতে উঁকি মারা
একটু যেন মাতাল হাওয়া
পাল তুলে দে পাগল পারা...

একটা শিয়াল আজও ডাকে
গ্রামের পটে শহুরে তুলি
হয়ত এবার ছিনিয়ে নেবে
সেই কর্কশ আদিম বুলি... ■

শিব দুহিতা নর্মদা

সপ্তম পর্যায় (২)

ডাঃ অমিত চৌধুরী

৩০শে অগাস্ট বুধবার। সকাল ছ'টায় বেরিয়ে পড়েছি। প্রায় চার কিলোমিটার যাওয়ার পর একটি গ্রাম পেলাম। এক প্রবীণ মানুষ আমাদের চা-খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। চার পুরুষ একই সঙ্গে সুখে সংসার করছে দেখে ভালো লাগল। গ্রামটির নাম চারখেরা। প্রায় চার কিলোমিটার যাওয়ার পর পেলাম তাওয়া নদী। সেতুটি প্রায় দুই কিলোমিটার লম্বা। ডানদিকে দুই কিলোমিটার দূরে নর্মদার সাথে তাওয়া মিলিত হয়েছে। আর বামদিকে খাণ্ডুয়া যাওয়ার রেলপথ। এই তাওয়া নদীকে আমরা পেয়ে ছিলাম বাঁদরভান গ্রামে। এই সব ভাবতে ভাবতে চলেছি। হঠাৎ একটি বড়ো গাড়ী আমার সামনে এসে দাঁড়াল। একটি লোক কলার ছড়া হাতে দিয়ে প্রণাম করলো। দিব্যানন্দজীর উৎসাহে কলাগুলির সৎব্যবহার করতে সময় লাগল না।

আমরা এলাম একটি গ্রামের মধ্যে। তারপরেই জঙ্গল শুরু। দু'পাশে জঙ্গল মাঝখানে পিচ ঢালা রাস্তা। আজকে অশোক দাসজীর শরীরটা খুবই খারাপ। বার বার গাছের তলায় বসে পড়ছেন।

নমামি দেবী নর্মদে

রাস্তা গ্রামের কোনো নূতনত্ব নেই, সব একই রকম। এইভাবেই এক একটি জনপথকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি। আজ মধ্যাহ্ন ভোজন হয়নি বলে দিব্যানন্দজী একটু অসন্তুষ্ট আছেন। কিন্তু কাকাজী আর অশোক দাসজী খাওয়ার জন্য সময় নষ্ট করতে চাইছেন না। কারণ আমাদের লক্ষ্য ওঙ্কারেশ্বর। দূরত্ব শুনলাম, পঁচাত্তর কিলোমিটার। সূর্যের উত্তপ্ত আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে মাঠের পথ ধরলাম। এই পথটা নাকি আরো কিছুটা সংক্ষিপ্ত হবে। অত্যন্ত খারাপ রাস্তা, পথ চলার কোনো রাস্তাই নেই। জল কাদা ভেঙে এগিয়ে চলেছি। সকাল থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার হেঁটে এলাম একটি শহরে। নাম মুণ্ডী। রাত্রে আশ্রয় এবং ভোজন জুটে গেল।

সকাল সাড়ে ছ'টায় নর্মদা মাকে প্রনাম করে বেড়িয়ে পড়েছি। যেহেতু আশ্রমে চা খেয়েছি তাই চা খাওয়ার জন্য সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দিব্যানন্দজীর আরো বিশ্রাম দরকার। আরো খাওয়ার দরকার। সমুদ্রের কাছাকাছি এলে নদীর যে প্রবল স্রোত এবং উচ্ছ্বাস থাকে আমাদেরও তাই হচ্ছে। কারণ আমরা ওঙ্কারেশ্বরের কাছাকাছি এসে গেছি। অশোক দাসজী ও কাকাজী একটু ধৈর্য্য হারা হয়ে পড়েছিলেন, দিব্যানন্দজীর এই ভাবে সময় নষ্ট করার জন্য।

আজ ৩১শে অগাস্ট বৃহস্পতিবার। একটি একটি করে গ্রাম পিছনে ফেলে অন্য একটি নতুন গ্রামে এসে পড়ছি,

নমামি দেবী নর্মদে

এইভাবেই ফেলে এলাম কৌনুদ, ভ্রামরি, জলোবা, দেওলা আরও কতো গ্রাম। সব গ্রামের একই রূপ। বিকাল পাঁচটার সময় এলাম আদুদখাস গ্রামে। কিন্তু এখানে সেভাবে থাকার জায়গা নেই। একটি আশ্রম পেলাম ঠিকই, মহন্তো আজই দেহ রাখার জন্য থাকা যাবে না।

আজও মধ্যাহ্ন ভোজন হয়নি। এই কথাটি বারবার দিব্যানন্দজী মনে করিয়ে দিচ্ছেন। তাই একটি চায়ের দোকানে সাময়িক বিশ্রাম। পাশেই নদী বয়ে চলেছে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। থাকার জায়গা এখনো পাইনি। চলার ক্ষমতা আর নেই। মাইল ফলক দেখে বুঝলাম আজ সাতচল্লিশ কিলোমিটার হাঁটা হয়েছে। একটি দোকান ঘরের সামনে দুজন পরিক্রমাকারী শুয়ে আছে দেখে আমরাও আসন পাতলাম। আমাদের কথাবার্তা শুনে পাশের দোকান থেকে এক ডাক্তারবাবু এসে আমাদের সাথে পরিচয় করলেন — উনিও বাঙালী। রানাঘাটে বাড়ি। পাঁচ বছর হলো এখানে আছেন। খুব শ্রদ্ধার সাথে আমাদের রাত্রের খাবার এবং এই দোকানের বারান্দাতেই থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। শুনলাম আরও তিন কিলোমিটার দূরে একটি ভালো আশ্রম আছে, হাতিয়া বাবার আশ্রম। কিন্তু আমরা যেতে অক্ষম।

আজ ১লা সেপ্টেম্বর। খুব ভোরেই বেরিয়ে পড়েছি। মা চাইলে আজই হয়তো ওঙ্কারেশ্বর পৌছে যাবো। তাই সকাল ছ'টাতেই রাস্তায় নেমে পড়েছি। গুলগাঁও হাতিয়াবাবার

নমামি দেবী নর্মদে

আশ্রম পেরিয়ে ডান দিকের কাঁচা রাস্তা ধরলাম। শুরু হল খাণ্ডুয়া জেলা। বামদিকে সাত কিলোমিটার লম্বা একটি খাল। এই খাল ধরেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পেরিয়ে গেলাম গুজলি, খকবারা, অঞ্জুরূদ, ধাউরিয়া হয়ে কোঠি গ্রামে। এই ধাউরিয়া গ্রামটি দক্ষিণতটে। এরই উত্তর তটে ধাবরি কুণ্ড। দুপুর একটায় এলাম একরতি বাবার আশ্রমে। মধ্যাহ্ন ভোজ পাওয়া গেল, খুব বিশাল আশ্রম। পরিক্রমাকারীদের বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। এখানে শিবলিঙ্গ এবং রুদ্রাক্ষ তৈরীর কারখানা আছে ।

দুপুর তিনটে। আমরা বেরিয়ে পড়েছি। হয়তো আজই লক্ষ্যে পৌছে যাব। চরম উত্তেজনা অনুভব করছি। এই পথ ধরেই কয়েক হাজার বছর আগে তেরো বছরের একটি বালক সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে পায়ে হেঁটে ওঙ্কারেশ্বরে এসে ছিলেন গুরুর সন্ধানে। আরও কতো মুনি ঋষিদের পদধূলি শরীরে মেখে আমরা এগিয়ে চলেছি।

আমার এক বন্ধু তার গেস্টহাউসে থাকার ব্যবস্থা করে ছিলেন। কিন্তু দিব্যানন্দজী নিয়ে গেলেন অন্য একটি ধর্মশালায়। থাকার উপযুক্ত না হওয়ায় রাত্রের মতো আশ্রয় নিলাম গজানন আশ্রমে। তিন বছর আগে আমি এই আশ্রমে উঠে ছিলাম। তিন বছরের ব্যবধানে ওঙ্কারেশ্বরের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। বেশ কিছু স্বঘোষিত গুরু এবং তাদের আশ্রম আছে। আর আছে তাদের পৃষ্টপোষক অর্থবান শিষ্যদের দাপট। এখন কিছুটা বেড়ানোর জায়গা, নদীতে

প্রমোদ ভ্রমণ, বড়ো বড়ো হোটেলের উদ্দাম আনন্দ কোনো কিছুরই ত্রুটি নেই। স্বয়ং ওঙ্কারেশ্বর জানেন গতি প্রকৃতি কোন দিকে যাচ্ছে।

গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী প্রচুর দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তাদের পোশাকের মতো অন্তরটা গেরুয়া হয়নি। তাদের আচরণেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। এক সন্ন্যাসী অবধূতের লেখায় পড়ে ছিলাম, "শিখাসূত্র বিরজাগ্নিতে আহুত দিলেই আসক্তি ত্যাগ হয় না। সে ক্ষেত্রে বিরজা না করাই ভালো। শুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতিতে অবগাহন করে সন্ন্যাসের মার্গে উত্তরণ ঘটলেই প্রকৃত বিরজার অধিকার হয়। বিরজা হোম মানে পূর্ণ সন্ন্যাস। প্রাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এতে প্রাণ স্থির হয়। স্থির প্রাণে ব্রহ্মের এবং ব্রহ্মের জ্যোতি প্রতিফলিত হয়। অজ্ঞান নাশ হয়। জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। জন্ম-জন্মান্তের কর্ম ক্ষয় হয়। সাধক ব্রহ্মানন্দে থাকেন।"

কিন্তু তা না হয়ে একি! বাকচতুর, শাস্ত্রাদি মুখস্থ করে বলা অযোগী, অক্রিয়াবান, হাতে দামী ঘড়ি, দামি স্মার্ট ফোন নিয়ে অযোগ্য গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীরা গুরু হয়ে আশ্রম আলো করে এয়ারকণ্ডিশান ঘরে বসে আছেন। এইসব বিষফল, অমৃত ফলের রূপ ধরে শিষ্য আকর্ষণ করে চলেছে। ফলস্বরূপ গুরু-শিষ্য দুজনেরই পরকাল শেষ। এরাই বাঙালীদের মছলীখোর বলে বিদ্রুপ করে এবং অর্থবান শিষ্যের কাছ থেকে মোটা টাকা গুনে পকেটে ঢোকায়। এই তথাকথিত গুরুর অনেকেই তাদের নামের প্রকৃত অর্থ

জানেন না। এই সব দেখার বা ভাবার দায় এবং দায়িত্ব 'মা নর্মদা' আমাকে দেননি। তাই আমাদের কাজে মন দিলাম। এবারের মতো পরিক্রমা এখানেই সমাপ্ত করে ক্লান্ত শরীর ও মন নিয়ে আশ্রমের বিছানায় আশ্রয় নিলাম।

আজ ২রা সেপ্টেম্বর। খুব ভোরে উঠে অমলেশ্বর, বিষ্ণুপুরী, ব্রহ্মাপুরী, মার্কেণ্ডয় শিলা ইত্যাদি দর্শন করলাম। ঝুলাপুল পেরিয়ে ওপাড়ে যাওয়া যাবে না। কারন ওটি উত্তরতট।

মার্কণ্ডেয় শিলার কাছে একটি বাঙালী সাধু আমার কাছে এসে বললেন, "আপনি তো বাঙালী কলকাতা থেকে এসেছেন।" আমি যে জায়গায় থাকি সেই জায়গার নামটিও বললেন। এবং বললেন পরেরবার যখন এখান থেকে শুরু করবেন আমার কুঠিরের পাশ দিয়েই রাস্তা, চা খেয়ে যাবেন। আগের থেকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম। বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। ফিরে এলাম কলকাতায়।

"নর্মদে হর।" (সপ্তম পর্বের সমাপ্তি) ...ক্রমশ ■

গভীর গোপন

প্রথম পর্ব, তৃতীয় অধ্যায়

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

পরের দিন নীলোৎপল কোন রিস্ক না নিয়ে সোজা মানালি থানার ও-সি-র সঙ্গে দেখা করে টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে বলল। প্রশাসনের সবসময়, সবক্ষেত্রে এমার্জেন্সি কোটা থাকে, শুধু রেলওয়েজে নয়, সর্বক্ষেত্রেই। আধ ঘন্টার মধ্যে কালকা থেকে কালকা-হাওড়া মেলের টু টায়ার এ-সির- টিকিট অন-লাইনে কাটা হয়ে গেল। অবশ্য এ-সির- টিকিট নীলোৎপলের বিশেষ অনুরোধে সহৃদয় বড়বাবু করে দিয়েছেন।

বড়বাবু বললেন, "আপনারা চাইলে পুলিশ ভ্যানে কালকা স্টেশন পর্যন্ত যেতে পারেন, অন্যথায় কার হায়ার করে সাড়ে-দশটা এগারোটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে। কারণ মানালি থেকে কালকা যেতে প্রায় দশ ঘন্টা সময় লাগে।"

নীলোৎপল ভাবল, পুলিশের গাড়ি করে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত, কারণ গাড়ি ভাড়া করলে রিস্ক নেওয়া হয়ে যেতে পারে। শুধু অফিসারকে বলল, "আমরা আমাদের লাগেজ নিয়ে থানায় আসবো, দয়া করে হোটেলে গাড়ি পাঠাবেন না।" অফিসার সম্মতি জানিয়ে শুধু বলল, "এগারোটার মধ্যে ঠিক

পৌঁছানো চাই।”

হোটেলে ফিরে নীলোৎপল খুব তাড়াতাড়ি লাগেজপত্র গুছিয়ে সুবর্ণরেখাকে রেডি হতে বলল। সুবর্ণ বলল, “কোথায় যাবো?”

“আপাততঃ পুলিশ স্টেশন, সেখান থেকে সোজা কালকা স্টেশন হয়ে কালকা মেল।”

“কেন আমরা পুলিশের গাড়ি করে যাবো, আর কেনই বা আজকেই আমাদের যেতে হবে? আমরা কি করেছি?”

নীলোৎপল জবাব দিল, “আমরা নয়, বলো আমি কি করেছি?”

“সতীশদার ব্যাপারটার মধ্যে তুমি যে পুরোপুরি ইনভল্ভড, আমি সেটা জানি। কারণ সতীশদার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা আমার, বাড়ির লোকেদের এমন কি কণিকারও জানতে বাকি নেই। দুর্ভাগ্যবশতঃ কণিকা আজ নেই। তুমি পাপী, পাপের সাজা তোমাকে পেতেই হবে। স্ত্রী বলে আমি তোমাকে রেয়াত করবো না। জানবে বাবার রক্ত আমার গায়ে বইছে। আমি জেনেশুনে কোন অন্যায়কে সমর্থন করব না। ভালো চাও তো এক্ষুনি রেডি হয়ে আমার সঙ্গে চলো, নাহলে পুলিশ আমাদের সঙ্গে একই ট্রেনে যাবে এবং হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা বালিগঞ্জ পুলিশ স্টেশন। সেটা তুমি যেতে চাও, না বাড়ি গিয়ে ধীরেসুস্থে মাথা ঠান্ডা করে বালিগঞ্জ পি-এস-এ যাবে সেটা তুমি ঠিক করো, আমি নয়।” নীলোৎপলের কঠিন মেজাজের কাছে খেই হারিয়ে

সুবর্ণরেখা হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে রেডি হতে লাগল।

সারা রাস্তা দু'জনের মধ্যে কোন কথা নেই। পুলিশের জিপ তীব্র গতিতে চলছে। ঘন্টা দু'য়েক যাবার পর ড্রাইভার বললেন, "বাবু লাঞ্চ করে নিন, এখানেই ভালো খাবার পাবেন আর প্রায় দেড়টা বেজে গেছে।" নীলু সুবর্ণকে গাড়ি থেকে নামতে বলাতে সুবর্ণ বলে উঠল, "আমার খিদে নেই, আমি কিছু খাবো না।" নীলু বলে উঠল, "বাজে কথা ছাড়ো, এখানে না খেলে আর তিন-চার ঘন্টার মধ্যে কোন হোটেল পাওয়া যাবে না। দয়া করে রাস্তায় আর সিন ক্রিয়েট করো না, নেমে খেয়ে যাও।" সুবর্ণর খুব খিদে পেয়েছে, খিদের জ্বালা বড় জ্বালা। এখন জেদের বসে সত্যি যদি না খায়, তাহলে পরে পস্তাতে হবে, সেই কথা ভেবে সে সুরসুর করে গাড়ি থেকে নেমে সোজা হোটেলে ঢুকল। পুলিশের গাড়ি দেখে হোটেলের লোকেরা শশব্যস্ত হয়ে পড়ল। নীলোৎপল ড্রাইভারকে ডেকে নিল।

হোটেলটা বেশ বড় ও ভালো। গরম গরম সরু চালের ভাত, মুগের ডাল, আলুভাজি, ফুলকপির তরকারি আর চিকেন সবাই চেটেপুটে খেল। সুবর্ণর পেটের ছুঁচোটা এতক্ষন পরে ডন মারা বন্ধ করল। খাবার সঙ্গে মনেরও একটা ব্যাপার আছে। কেননা খাবার পর মনটা একটু ভালো হয়ে গেল সুবর্ণর। মিছরি দেওয়া মৌরি গালে পুরে চিবোতে চিবোতে সুবর্ণ গাড়িতে এসে বসল। গাড়ির ড্রাইভার নিজের

খাবারের দামটা দিতে গেলে নীলু তার হাত চেপে ধরে দাম দিতে বারণ করল।

সবাই গাড়িতে চেপে বসল। গাড়ি এবার নীচের দিকে একটু একটু করে নামতে লাগল। গাড়ির মধ্যে রাখা ওয়্যারলেস থেকে মাঝেমধ্যে থানা থেকে গন্তব্যস্থল কতদূর, আর সব ঠিক আছে কিনা এইসব কর্কশ শব্দতরঙ্গ ভেসে আসছে। সুবর্ণ হঠাৎ নীলোৎপলের হাতটা ধরে বলল, “তুমি আমায় বাঁচাও, আমি তোমার স্ত্রী।” নীলু তার স্ত্রীকে ভীষণ ভালোবাসে, তার সেই ভালোবাসার মর্যাদা সুবর্ণ দিতে পারেনি। তাই কষ্টহাসি হেসে বলল, “বাড়িতে চলো, বাবা কি বলেন দেখা যাক।” সন্ধ্যার দিকে আর এক জায়গায় গাড়ি দাঁড়ালো চা খাবার জন্য জীপে খুব অসুবিধা হয়, গাড়ি খুব ডানদিক বাঁদিক করে হেলেদুলে যাচ্ছে, আর পুলিশের জীপে আরাম করে যাবার কোন স্কোপ নেই। এরই মধ্যে গায়ে গতরে বেশ ব্যাথা হয়ে গেছে।

একটা দোকানে বসে ঘন দুধের আদামারা দু’টি চা খেয়ে নীলুর একটু যেন ভালো লাগল। ড্রাইভারকে জিজ্ঞসা করল, “আর কতক্ষন?” জবাব এলো, আরও প্রায় ঘন্টা তিনেক। উফ আর পারা যাচ্ছে না। তারচেয়ে এ-সি-গাড়ি নিয়ে এলে অন্তত কমফরট-টা পাওয়া যেত। জেদাজেদি করে বৌকে সবক শেখাতে গিয়ে, ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেই বেশী অসুবিধার মধ্যে পড়ল সে। জিপের ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া

ঢুকে কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করতে লাগলো আর কানে যন্ত্রণা শুরু হল।

কালকা স্টেশনে যখন পৌঁছালো ওরা, তখন প্রায় রাত দশটা বাজে। ড্রাইভারকে বিদায় দেবার আগেই ও-সির-ফোন, "কালকা পৌঁছেছেন তো?" "হ্যাঁ, ধন্যবাদ" ও-সি- বললেন, "পৌঁছেই কিন্তু বালিগঞ্জ পি-এসে- যোগাযোগ করবেন, একদম দেরী করবেন না, আপনাদের ভালোর জন্যই বলছি।" ধন্যবাদ জানিয়ে নীলোৎপল ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

এগারোটার পর ট্রেন কালকাতে ঢুকল। ধীরে সুস্থে ট্রেনে উঠে নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়ার কিছুক্ষনের মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিল। সঙ্গে আনা স্যান্ডুইচ ও মিষ্টি খেয়ে দুজনের বিছানাটা নীলু সুন্দর করে পেতে নিল। অসম্ভব ক্লান্ত, শরীর আর নিতে পারছে না, দু'চোখ বুজে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় নীলু ঘুমিয়েও পড়েছিল। হঠাৎ তীব্র ঝাঁকুনিতে নীলুর ঘুম ভেঙে গেল। তীব্র গতিতে ট্রেন এগিয়ে চলেছে, বোধহয় কোনো সেতুর উপর দিয়ে যাচ্ছে, তাই গাড়ির দুলুনি বেশি। এ-সি- কম্পার্টমেন্টের স্বল্প আলোতে সুবর্ণর মুখের দিকে তাকিয়ে নীলুর খুব কষ্ট হল। কত নিষ্পাপ মুখ। কত সরলতা যেন ছড়িয়ে আছে মুখমন্ডলে। গায়ের কম্বল নেমে নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। নীলু বার্থ থেকে নেমে সুন্দর করে কম্বলটা সুবর্ণর গায়ে চাপিয়ে দিয়ে মুখের দিকে

তাকিয়ে রইল। থুতনিটা হাতে ধরে নিজের অজান্তে মুখে হাতটা ঠেকিয়ে চুমু খেল। ভাবলো, এই সুন্দর সরল মুখের আড়ালে একটা হিংস্র মন আছে। "অপরাধী হলে তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারবো না সুবর্ণ।" সেই কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা ঈশ্বর যেন আমাকে দেন। দু'ফোটা অশ্রু চোখের কোল দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। বাকি রাতটা আধো ঘুম, আধো জাগরণে কেটে গেল।

দু'রাত্রির নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ট্রেন জার্নি করে তার পরের দিন বেলা বারোটা নাগাদ বিধস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে ওরা দেখে গোটা বাড়ি থমথমে। নীলোৎপল বাবার ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, "বাবা আজকেই কি আমাদের বালিগঞ্জ থানায় যেতে হবে? না, কালকে গেলেও চলবে?" – "আমি ডি-এস-পির সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি। তোমরা ভীষণ টায়ার্ড, স্নান, খাওয়া-দাওয়া করে রেস্ট নিয়ে নাও। আমরা সন্ধ্যাবেলা কথা বলব।" সুবর্ণ মাথা নীচু করে আছে, কারোর দিকে সে মুখ তুলে তাকাতে পারলো না।

সন্ধ্যাবেলা বাবার ঘরের বিশাল টেবিলটার কাছে ওরা যখন গিয়ে উপস্থিত হলো তখন সেখানে শাশুড়ি মা-ও ছিলেন। সুবর্ণকে দেখেই মা কেঁদে বললেন, "তোমার কি ক্ষতি করেছি আমরা যে আমাদের এত বড় সাজা দিলে আমাদের মান-সন্মান সব ধুলোয় লুটিয়ে দিলে আমার ছেলেটার জীবন কেন নষ্ট করে দিলে..." এই বলে তিনি

কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, "রমলা একটু চুপ করো। অনেক কিছু এখন আলোচনা করতে হবে। কেঁদেকেটে সময় নষ্ট করো না প্লিজ।" সুরেন্দ্রনাথ ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট এসে গেছে...And it is Antimortem in nature. মানে কণিকা আত্মহত্যা করেনি, তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে It's a case of murder."

সুবর্ণরেখা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। সেদিকে খেয়াল না করে সুরেন্দ্রনাথ বলতে লাগলেন, পোস্ট মর্টেমের একটা কপি আমাদের দেওয়া হয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে ঘটনার কোন সাক্ষী নেই। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন কণিকার বাবা-মা তারাপীঠে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। সেই দিনটা শনিবার ছিল। তাঁদের রবিবার দিন ফেরার কথা ছিল এবং যথাসময়ে তাঁরা ফিরে এসে মেয়ের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। বডি প্রায় decomposed হয়ে গিয়েছিল। পুলিশের জেরায় তাঁরা জানিয়েছেন, তাঁরা মেয়েকে বার বার করে তাঁদের সঙ্গে তারাপীঠ যেতে বলেছিলেন – এমন কি ফাইনালি তাঁরা তারাপীঠ যাওয়াটাও ক্যানসেল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মেয়ে কিছুতেই রাজি হয়নি। কেন রাজি হয়নি, সেটা পুলিশ কিছু জানায়নি। কিন্তু আততায়ী সেটা জানতো যে বাড়িতে কণিকা একা আছে। ফরেনসিক রিপোর্টে বলা হয়েছে রাত্তির ন'টা থেকে ন'টা দশের মধ্যে

তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে এবং পুলিশের স্থির বিশ্বাস সেখানে অপরাধী ছাড়াও আর একজন উপস্থিত ছিল – এবং সম্ভবত দু'জন অপরাধীই কণিকার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল, আর সেই দু'জন কণিকার চেনা। তাই পরিচিত জনের গলার আওয়াজ শুনে সে দরজা খুলে দিয়েছিল বা এমনও হতে পারে কনিকাও তাকে, মানে আততায়ীকে বাড়িতে আসার কথা বলতে পারে, কিন্তু বুঝতে পারেনি যে সে খুন হয়ে যাবে। সদর দরজা ভিতর থেকে খোলা হয়েছিল এবং আততায়ীরা কাজ শেষ করার পর দরজা টেনে বন্ধ করে দিয়েছিল যাতে বোঝা যায় দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। যদিও প্রত্যক্ষ কোন সাক্ষী নেই কিন্তু Circumstantial evidence দেখে পুলিশ নিশ্চিন্ত যে It's a case of murder.

পুলিশ বালিশ, চাদর, প্লাস্টিকের মোটা দড়ি, যেটা গলায় লাগিয়ে ঝোলানো হয়েছিল সেটা ও বাথরুমের মধ্যে দু-জোড়া গ্লাভস বাজেয়াপ্ত করেছে – এবং সেই থেকে পুলিশ নিশ্চিন্ত হত্যাকারী একজন নয়, দু'জন।

পুলিশ আমাদের বাড়িতে এসে আমার অনুমতিক্রমে তোমাদের ঘরটা সার্চ করেছে। আলমারি খুলিয়ে বৌমার শাড়ি-গহনা, ভ্যানিটি ব্যাগ, বইপত্র, ডায়েরি অফিসের কাগজপত্র চেক করেছে এবং একটা ভ্যানিটি ব্যাগ যেটা খুলে ভিতরটা দেখিয়ে দিয়েছিলো যে তার মধ্যে কিছু ছিল

না, ছোট্ট একটা ভাঁজ করা কাগজ নিয়ে গেছে এবং সিজার লিস্টের সঙ্গে ঐ ব্যাগ ও কাগজটা অ্যাড করেছে, আর আমাকেও একটা কপি দিয়ে গেছে। আমি প্রতিবাদ করে ঐ ব্যাগ ও কাগজটার ব্যাপারে জানতে চাইলে অফিসার জানিয়েছে, "মিস্টার চ্যাটার্জী, এটা একটা হাতে লেখা চিঠি যেটা সতীশ চ্যাটার্জী আপনার বৌমা সুবর্ণরেখাকে লিখেছিলো, আর একটা খালি ভ্যানিটি ব্যাগ। এটা আমাদের তদন্তের কাজে হয়তো সহায়তা করতে পারে।"

এবার বৌমা তুমি বলো, "সেদিন তুমি কোথায় ছিলে, তুমি কি সত্যিই ব্যাঙ্কের কনফারেন্সে গিয়েছিলে! পরের দিন তোমার বলে যাওয়া হিসাবমতো বারোটা নাগাদ তুমি বাড়ি ফিরেছিলে। পুলিশ এই ব্যাপারটা নিয়ে শুধু আমাদের জিজ্ঞাসা করেছে যে তুমি কোন ব্যাঙ্কে, কোন ব্রাঞ্চে চাকরি করো, আর কনফারেন্সের ব্যাপারটায় আমরা কনফারমড কিনা? তুমি যেমন আমাদের বলে গেছো তার বাইরে একটা কথাও আমরা বলিনি, আমরা শুধু বলেছি – হ্যাঁ ও কনফারেন্সে গিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট থাকার কারণে আমি এইটুকু বলতে পারি কেসটার মধ্যে কিছু lacuna (ফাঁক) আছে। তবে কি তুমি..." ...ক্রমশ ■

'গুঞ্জন'-এর ২০২২-এর আগামী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

নভেম্বর ২০২২ – মিশ্র সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০২২ – অণু সংখ্যা

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা 'গুঞ্জন'-এ দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল'-এ (contactpandulipi@gmail.com) পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট 'ফরম্যাট'-ই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি 'পাসপোর্ট সাইজ'-এর ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর **'পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)'** গোষ্ঠীতে অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: নভেম্বর ২০২২ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই অক্টোবর, ২০২২

ভ্রমণ-কাহিনী

ডিসকিট বৌদ্ধ মঠ

সমীর দাস

কাজের খাতিরে বহুবার লেহ শহরে আসা হয়। কিন্তু কাজের চাপে, শহরের আশপাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা হয়নি। তাই এবার বেশ কিছু সময় নিয়ে এসেছিলাম, আর সেই সুযোগে লেহ-লাদাখের অনেক জায়গা দেখা হয়ে গেল। তবে সব চেয়ে ভালো লেগেছিল নুব্রা উপত্যকার হুন্দার গ্রাম আর ডিসকিট বৌদ্ধ মঠ।

ডিসকিট মঠের প্রবেশ দ্বার...

লেহ শহর থেকে যাত্রা। পাশে বয়ে চলেছে সিন্ধু নদীর

কোন শাখানদীর নীল জল, আর পাথরের অদ্ভুত অদ্ভুত স্থাপত্য কারুকার্য্যে ভরা পাহাড়-পর্বতের সারি। পেরোতে হল খরদুংলা পাস বা গিরিপথ। এটা আগে পৃথিবীর উচ্চতম বাহনযোগ্য পাস ছিল, এখন দ্বিতীয়। প্রথমের শিরোপা সম্প্রতি তৈরী উমিঙলা। তখন বরফ পড়ছিল না বটে, তবে গত রাতের তুষারপাতের চিহ্ন সর্বত্র।
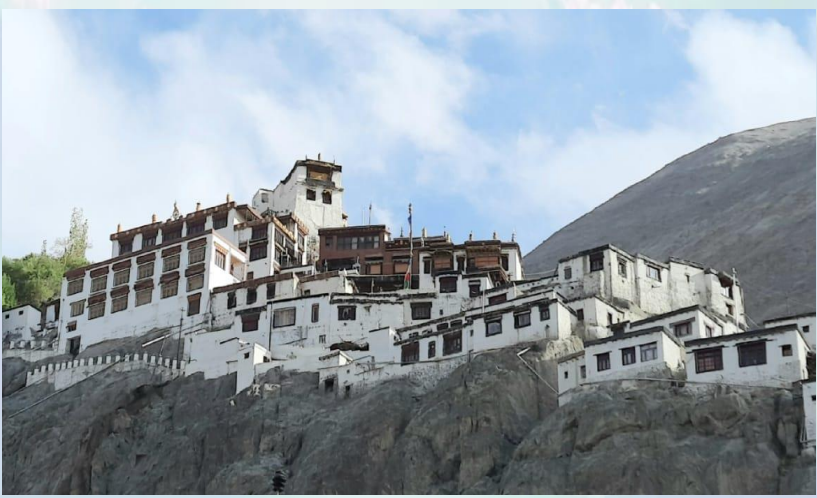
পাহাড়ের গায়ে ডিসকিট মঠ...

বরফে ঢাকা পর্বতের নানা শাখা-প্রশাখার মাঝে চলতে চলতে এগিয়ে চলেছি নুব্রা উপত্যকার পথে। এবার সাথী শিয়ক নদী। ধীরে ধীরে সবুজের ছোঁয়া দেখতে পাচ্ছি তার দু'পাশে। ডিসকিট তিব্বতি বৌদ্ধ মঠ এসে গেল, তবে আজ সেখানে যাওয়া হবে না। আপাতত গন্তব্য হুন্দার গ্রাম। আজকাল খুব বিখ্যাত হয়েছে গ্রামটি। কারণ শিয়ক নদীর পাশে বালিয়াড়ি, আর ব্যাকট্রিয়ান উট। তবে আমার কাছে

সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল তার শ্যামলিমা। লাদাখের তুষার মরুর মাঝে যেন মরুদ্যান।

হঠাৎ রাস্তার পাশে একটি ক্ষুদ্র দুর্গা মন্দির নজরে পড়ল, মূলত তার সাইন বোর্ড-এর জন্য। পাহাড়ের গায়ে, এক ছোট্ট গহ্বরে দশভুজা দুর্গা মূর্তি। পাশ দিয়ে এক ঝর্ণা বয়ে চলেছে। এই বৌদ্ধ অঞ্চলে মা দুর্গার দর্শন পেয়ে রোমাঞ্চিত হই।

পাহাড়ের গায়ে ডিসকিট বৌদ্ধ মঠ আর সেই বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তি নজরে আসে, তবে বেশি তাকাই না সেই দিকে। কাল এসে দেখব নয়ন ভরে।

পাহাড়ের ওপর মৈত্রেয় বুদ্ধ মূর্তি...

এবার সামনে যেন এক সবুজ প্রাচীর। শিয়ক নদীর বালিয়াড়ির ধারে হুন্দার গ্রামের পপলার বন। আগে থেকে

কোনো স্থির ছিল না, তবু অনেক খোঁজাখুঁজি করে এক তাঁবুর রিসর্টে ঠাঁই হল। সেখানেই নিশিযাপন, সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বটে। কালো কালো পাথরের পাহাড়ের পাদদেশে সবুজের মাঝে বসত। সারারাত বাইরে হাওয়ার শন শন আর ঝর্ণার গান। পরের দিন এলাম ডিসকিট মঠে। অনেক শুনেছিলাম এই বৌদ্ধ মঠের কথা, তার দর্শনের সুপ্ত আকাঙ্খাটি আজ পূর্ণ হতে চলেছে। পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে পাহাড়ের সাথে উঠে গেছে মঠের এক একটি অংশ। গাড়ি যায় কিছু দূর অব্দি, তারপর পদযুগল ভরসা। যেন এক শৈলশহর। সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে এলাম প্রধান চত্বরে। মাঝে মাঝে তিব্বতি বৌদ্ধ স্থাপত্যের তোরণ। বিশাল প্রার্থনা চক্র। বহু প্রাচীন মঠ, অনেক অনেক জায়গা তো ধ্বংসের মুখে। লাদাখের অন্য মঠগুলির তুলনায় কেমন যেন দৈন্যদশা।

একদম উপরে উঠে মঠের মুখ্য অংশে চলে এলাম। প্রবেশ দ্বারে সুদৃশ্য তোরণ। বলতে গেলে একাই ছিলাম, মাঝে মাঝে কিছু লামা নজরে আসছিল। আর নজরে আসছিল নীচে নুব্রা উপত্যকার সৌন্দর্য, আর তার পাশের পাহাড়ের সেই বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তি।

এই মঠটি "গেলুগপা" (হলুদ টুপি, yellow hat) তিব্বতি বৌদ্ধ গোষ্ঠীর। এটি ১৪ শতাব্দীতে "চ্যাঙজেনৎসেরাব জ্যাংপো" প্রতিষ্ঠা করেন। লেহ শহরের কাছে বিখ্যাত "ঠিকসে" গোম্পার-ই অন্তর্ভুক্ত।

মঠের অন্তর্বর্তী প্রবেশপথ...

এক অদ্ভুত অপার্থিব অনুভব এল এইখানে পৌঁছে। নিঃশব্দ, এই চেনা পৃথিবীর বাইরে যেন। ধর্ম, ভগবান ইত্যাদি কি জিনিস আজো বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু এখানে এসে মনে এল এক আশ্চর্য অনুভূতি! নিজেকে যেন উজাড় করে দেওয়া যায় এখানে।
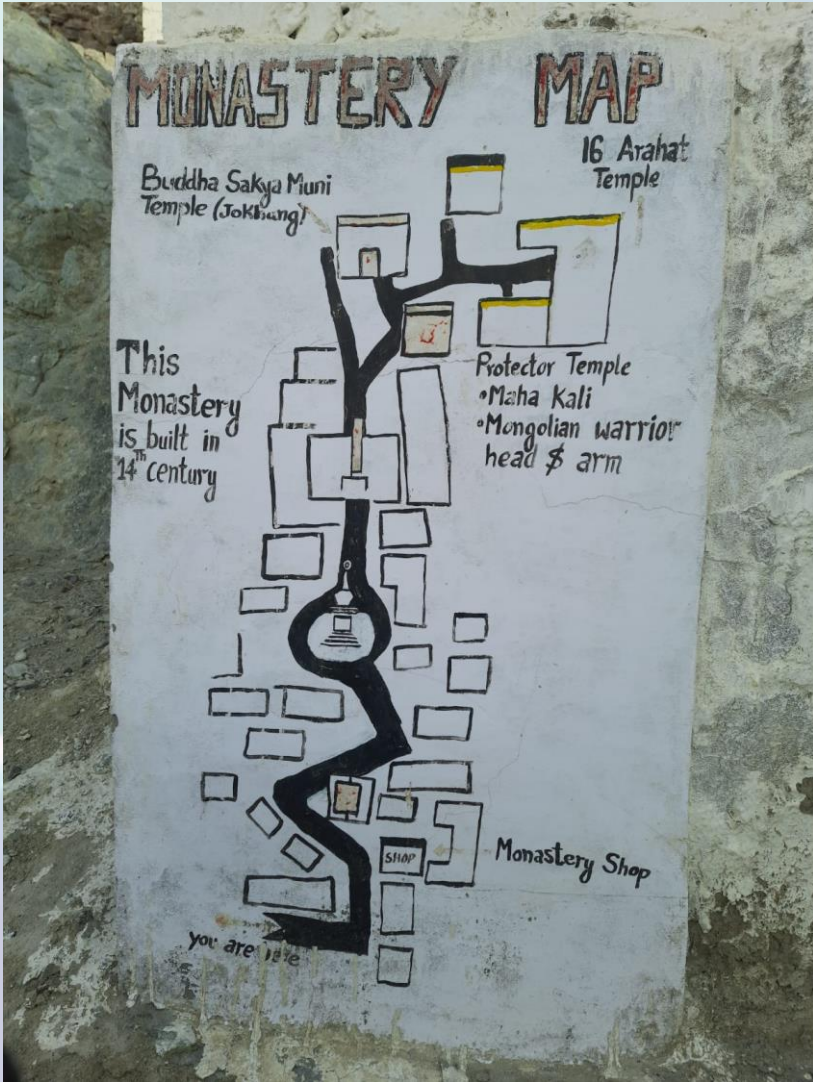
মঠের মানচিত্র...

প্রায় ১০০ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকেন নাকি এখানে। বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষাও দেওয়া হয়। "দোষমোচে" বলে একটি উৎসবও হয় এখানে ফেব্রুয়ারী মাসে। উৎসবটি অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির জয়ের প্রতীক বিখ্যাত মুখোশ নৃত্যের অনুষ্ঠান।

মুখ্য অংশটি ভগ্নপ্রায়, সেখানে প্রবেশ আপাতত নিষিদ্ধ। সেখানে নাকি দেয়ালে তিব্বতের "তাশিল - হুন -পো" মঠের ছবি, অনেক মঙ্গোলীয় ও তিব্বতি মূর্তি, প্রাচীন পুস্তক ইত্যাদি আছে।

দুর্ভাগ্য! দেখা হল না। এখানেই নাকি কোন বৌদ্ধ বিরোধী মঙ্গোলীয় দানবকে হত্যা করা হয়েছিল, যার মৃতদেহ এখানেই নাকি কোথাও গ্রথিত আছে। ভেবে অবাক হই মঙ্গোলীয় প্রভাব এই লাদাখেও ছিল!

হাতে আঁকা একটি ম্যাপে সেই সব জায়গা দেখানো আছে। ঠিক সে মঠের মত মহাকালী'র মন্দিরও আছে দেখলাম। তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মে মহাকালীর বেশ প্রভাব ছিল বোঝা যায়। কিছু মন্দির দেখলাম বন্ধই রাখা। দরজার বাইরে সুদৃশ্য তিব্বতি নকশার পর্দা দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হল, একজন লামা এসে পৌঁছেছেন বিভিন্ন মন্দিরগুলি বন্ধ করতে। তাই তাড়াতাড়ি যতটুকু দেখা যায় দেখে নিলাম। "জোখাং", "দুখাং", "জিমচাং", "চোখাং" এইরকম সব নাম মন্দিরগুলির।

প্রার্থনা চক্র...

"দুখাং" হল মুখ্য প্রার্থনা মন্দির। এখানে বুদ্ধের "শাক্যমুনি" রূপ। ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে শুধু প্রদীপের আলোয় এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। কিছুক্ষনের মধ্যেই মনে

অপার শান্তি চলে আসে।

ভিতরের ফটো তোলা বারণ, তাই মনের মধ্যেই শুধু ছবি নয়, সে অপূর্ব অনুভূতি সঞ্চিত করে বাইরে এসে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। হলুদ টুপি (yellow hat) বৌদ্ধ গোষ্ঠীর সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছিলাম পরে। তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম মহাযান শাখার। এর চারটি মূল গোষ্ঠী, নিংমাপা (লাল টুপি, প্রতিষ্ঠাতা - পদ্মসম্ভাবা), কাগয়ুপা (সাদা টুপি, প্রতিষ্ঠাতা - তিলোপা). শাক্যপা (প্রতিষ্ঠাতা - গনচোক গ্যেলোপো), গেলুগপা (হলুদ টুপি, প্রতিষ্ঠাতা - ৎসং খাপা লবসাং দ্রাকপা বা যে - রিনপোচে, দালাই লামা এই গোষ্ঠীর শীর্ষে)। গেলুগপা গোষ্ঠী সবচেয়ে নতুন কিন্তু এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ। সুশৃঙ্খল বজায় রেখে ধ্যানমার্গে নির্বাণ প্রাপ্তি এদের সাধন পথ। লাল টুপি গোষ্ঠী আবার তন্ত্রমতে বিশ্বাসী।

এবার ফিরে যাবার পালা, গন্তব্য পাশের পাহাড়ের উপর সেই বিখ্যাত মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি। ৩২ মিটার উঁচু পদ্মাসনে হাস্যমুখে বসে আছেন বুদ্ধ, তাঁর শান্তির বাণী নিয়ে। সেই শান্তির বাণী হিমালয়ের এই নিভৃত কোণ থেকে এখনো ছড়িয়ে পড়ছে পুরো বিশ্বে, তাইতো এত অশান্তির মাঝেও মাঝে মাঝে শান্তির অনুভব হয়।

প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড় এখানে, অথচ রাস্তার ওপারে ডিসকিট মঠে কাউকে দেখতে পাইনি। বিশাল অঙ্গন,

হলুদ টুপির গোষ্ঠীর সাজ...

শিয়ক নদীর উপত্যকায় বহুদূর নজর চলে যায়। আর কি সুন্দর সৌম্য মূর্তি, এত ভিড়ের মাঝেও হট্টগোল নেই। মূর্তি প্রদক্ষিণ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা চক্র ঘোরানো। এই প্রার্থনা চক্রের ব্যাপারটি আমার খুব ভাল লাগে। মনের সব কালিমা যেন মুছে যায়।

মনে অপার শান্তি আর সন্তুষ্টি নিয়ে ফিরে চলেছি। যে উদ্দেশ্যে আসা হয়েছিল, পুরো সার্থক। থিকসে, হেমিস ও আরো কিছু মঠ আগেই দেখা হয়ে গেছে, তখনই এইখানে আসার ইচ্ছে জেগেছিল। এবার যাব লাদাখের সেই বিখ্যাত প্যাংগং সো হ্রদে। সে আলাদা কাহিনী।

ওঁ মণিপদ্মে হুঁ। ■

আকাশের চোখে ঘুম নেই

গোবিন্দ মোদক

আকাশের চোখে ঘুম নেই
দিনে রুটি পোড়া সূর্য
আর রাতে ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ
এদের দু'জনকে বুকে নিতে নিতেই
ফুরিয়ে যায় তার দুরন্ত যৌবন
তার ওপর তারাদের বায়নাক্কা
আর কত সহ্য করে মোহিনী আকাশ
তারও তো শরীর!
বেহিসাবী ব্যবহারে
ঝুলে গেছে তার স্তন
ক্ষতবিক্ষত যোনি
তবু আকাশ সূর্য ওঠায়
চাঁদ জাগায়
অনন্তকাল ধরে ...

বাঁধন

অনিৰ্বাণ বিশ্বাস

"তোমাকে আগেই বলেছিলাম এতো বেঁধে রেখো না। বাঁধন বেশি হলে দড়িতে চাপ পড়ে। সব জিনিসের মতোই সহ্য করতে করতে একসময়ে দড়িটাই ছিঁড়ে যায়। তখন আর বাঁধন? এই সহজ সত্যটাই যদি না বুঝতে পারলে তো কিসের অভিজ্ঞতা!!" অনিমেষ চশমা খুলে চোখটা মুছে নিল।

মিলি হাউমাউ করে কেঁদে বলল, "কিন্তু এতোদিন ধরে তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করে ওকে যে স্নেহের বাঁধনে গড়ে তুললাম, সেটা কি তাহলে মূল্যহীন?"

অনিমেষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার আমাদের পুষির কথা মনে পড়ে?"

মিলি কান্নার মাঝে একটু তাকিয়ে হেসে ফেলল, "মনে থাকবে না আবার! সেই যে বৃষ্টির রাতে আমাদের পুকাই ঐ বাচ্চা বিড়ালটাকে ঘরে ঢুকিয়ে একটা পিচবোর্ডের বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল সে তো তুমি জানতেই না বহুদিন। কারণ তোমার তো বেড়াল বড়ো অপছন্দের জিনিস। তারপর একদিন সকালে তুমি ঘুম থেকে উঠে

আবিষ্কার করলে তিনি তোমার গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। আর তোমার কি রাগ! পুকাই তাড়াতাড়ি ওকে কোলে করে আমার পিছনে লুকিয়ে পড়েছিল। আমাকে বলছিল মা পুষিকে বাবা বের না করে দেয়। আমি শেষে অনেক বুঝিয়ে তোমাকে রাজি করি। তুমি তো বহুদিন পর্যন্ত ওকে মানতে পারোনি।"

অনিমেষ মিলির দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "তারপর তোমাদের পুষির বাচ্ছা হলো। তারা আবার বড়ো হল।"

মিলি তাকে থামিয়ে হঠাৎই বলল, "বাব্বাঃ! সে তো এক বিরাট ঝক্কি! বাচ্চাদের খাওয়ানো, তাদের জন্য আলাদা জুতার বাক্সে বিছানা করে দেওয়া! বাব্বাঃ!"

"দাঁড়াও দাঁড়াও! হঠাৎই পুষির কথা কেন হচ্ছে?" মিলি একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। অনিমেষ বলল, "বাচ্চাদেরকে মানুষ করার কথা মনে আছে, কিন্তু তারা বড়ো হবার পর কি হলো ভুলে গেলে?" তারপর হঠাৎই একদিন পুকাই আবিষ্কার করল ওরা কোথায় চলে গেছে। পুষি আবারও..."

"থাক থাক... কিন্তু তুমি একটা... তার সাথে আমাদের এই ঘটনাটা... কোথাও মিল খায়?" মিলি অবিশ্বাস্য কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "ও একটা..."

অনিমেষ মিলিকে থামিয়ে দৃঢ়ভাবে বলল, "কোথাও না

কোথাও অবশ্যই মিল খায়। স্নেহ আর আবেগের চাদরটা সরিয়ে ভালো করে ভেবে দেখো মিল খায়। কখনো না কখনো ডানা গজালে ছোট পাখিরাও সুনীল আকাশের টানে সব টান ছিন্ন করে চলে যায়। এটাই যে ভবিতব্য!”

মিলি সজল নেত্রে বলল, “আচ্ছা আমরা না হয় একটু বেশিই হয়তো ওদের সংসারে মাথা ঘামিয়ে ফেলেছিলাম। তা বলে ওদের নতুন ফ্ল্যাটে আমাদের একবারও যেতে বলল না। শুধু আমরা আসছি... ব্যাস, এটুকুই! যে পুকাই কথা বলে আমাদের কান ব্যথা করে দিত! আজ এটুকুই!”

অনিমেষ বলল “নতুন কমপ্লেক্সে, ওদের সবকিছুই নতুন! নতুন বন্ধু, নতুন চাকর, নতুন আসবাবপত্র! সবই যে নতুন! আমরা একটু পুরনো হয়ে যাচ্ছি না!” এই বলে মিলিকে সে জড়িয়ে ধরে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, “ছোট পাখিরাও যেদিন নতুন পাখায় ভর করে তাদের নতুন ঠিকানায় উড়ে যায়, মা পাখি কি এসব নিয়ে ভাবে? পুষিকে দেখে কি শিখলে? আমরাও আবারও নতুন করে সব শুরু করব, আমাদের মতো করে। আমাদের জীবন আর শুধুমাত্র কারোরই দয়াদাক্ষিণ্যের নির্ভরশীল হবেনা। কি পারবে না!”

মিলি অনিমেষের বুকে মুখ গুঁজে নীরব অশ্রুপাত করতে লাগল।

অনিমেষ কিছুক্ষণ পরে মিলির হাতে একটা জিনিস গুঁজে কানে কানে বলল, “মিলি, তোমাকে না জানিয়ে আমি

একটা জিনিস করে ফেলেছি, বুঝলে!” বলে মিটিমিটি হাসতে লাগল। মিলি হাতের কাগজটা খুলে দেখে দুটো নিউ জলপাইগুড়ির টিকিট। সে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে বলে, “এটা কি? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?”

অনিমেষ মিলিকে ধরে চোখ মুছিয়ে হেসে বলল, “মিলু, মনে আছে আমাদের প্রথম হানিমুন স্পট গ্যাংটক। এটা সেকেন্ড টাইম, হা হা!”

মিলি মুখ বেঁকিয়ে বলল, “বুড়োর ভীমরতি!” তারপর একটু সলজ্জ নয়নে দুজনেই দুজনার দিকে তাকিয়ে রইল। ■

স্মৃতি

টুকরো ছবি

চৈতি চক্রবর্তী

মনটা বড্ড খারাপ হয়ে আছে আর্সির। কেন জানি না কিছু ভালো লাগছে না। সংসারের সব কাজ সেরে, সে নিজেকে নিয়ে একটু বসতে চাইল। কিন্তু কি নিয়ে বসবে? তার নিজস্ব বলতে আজ আর কী আছে? সবটুকু তো নিজের হাতেই শেষ করে চলে এসেছে জীবনের এ পর্যায়ে। নাঃ ঘুম আসছে না। একটু কিছু ভালো স্মৃতি হয়তো ঘুম এনে দিতে পারে। আজ আর ঘুমের ওষুধটাও খেতে ইচ্ছে করছে না একেবারে।

নিজেকে নিয়ে সে চলে যায় গোটা পঁচিশ বছর আগে। তখন নিজেকে আগলানোর দায়িত্ব যেন শুধু তার নিজের ছিল না – ছিল পাশাপাশি সকলের। একবার অটোর লাইনে সে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ একটা খুব হ্যান্ডসাম ছেলে এসে দাঁড়ালো সামনে...

“প্লিজ আমায় একটু দাঁড়াতে দেবেন আগে? নাহলে ট্রেনটা মিস করবো।”

...মনে মনে ভাবলাম কি আব্দার, এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি আমি, তার কোনো দাম নেই? যাই হোক ভাবলাম থাক, হয়তো কোনো জরুরি কাজ আছে।

অগত্যা সরে দাঁড়ালাম। স্টেশন পর্যন্ত গন্তব্য একই ছিল। তারপর রাস্তা যার যার মতন হওয়ার কথা কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল ছেলেটা।

"একটা কথা বলতে চাই আপনাকে।"

"বলুন।"

"আমরা কি একটু কথা বলতে পারি?"

"বলছি তো বলুন।"

"না মানে একটু কোথাও চা খেতে খেতে বসে।"

রাজি হবার কোনো কারণ ছিল না তবু গেলাম। আসলে একটা কৌতূহল হচ্ছিল। চেনা লোকেরা বললে কারণ বুঝতে অসুবিধা হত না। কিন্তু অচেনা হওয়ায় আবার একটা ভয় ও কাজ করছে।

"আসলে আপনি যে অফিসে কাজ করেন কাকতালীয়ভাবে আমিও কাল জয়েন করতে চলেছি।"

আর্সির মনে পড়ল তাই তো আজ তো বস ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন। কিন্তু আমি তো ওকে দেখিনি। ও কি করে দেখল?

"ভাবছেন তো আমি কি করে জানলাম? আসলে ছুটির সময় দেখলাম আপনি ওখান থেকেই বেরোচ্ছেন। তাই..."

"বলুন কী জানতে চান?"

"আসলে কোম্পানির ফিউচার, ফিডব্যাক।"

"কেন মনে হলো যেখানে আমি কাজ করছি সেখানের

নেগেটিভ দিকগুলো আমি আপনাকে বলবো? আমি যখন কাজ করছি তখন তো...”

“সে ঠিক তবে আপনাদের তো চাকরি করাটা বাধ্যতা নয়। আমাদের বাধ্যতা।”

“সোজা ভাবে বলি। প্র্যাকটিস বা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করার জন্য ভালো কিন্তু ফিউচারের জন্য আমি বলবো ভালো নয়।”

“ওকে। তাহলে কিছুদিন করা যেতেই পারে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।” এরপর মাস খানেক চলল। বন্ধুত্বও বাড়ল।”

একদিন শ্রেয়াংশ অ্যাকাউন্সের কপিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, “আর্সি কিছুতেই একশো টাকার ডেফিসিটটা মেলাতে পারছি না। একটু চেক করে দেবে?”

আর্সি অবাক হয়ে গিয়ে ভাবে, “কি ছেলেটা। এম. কম., এম. বি. এ., সে নাকি বি. এস. সি. পড়া মেয়েটাকে বলছে চেক করতে? তবু এটা তার কাছে একটা বিশাল পাওনা। কেপেবল তো মনে করেছে। চেষ্টা সে করতেই পারে।

“কি বলছো? আমি? পারবো বলে তোমার মনে হয়? তবে চেষ্টা করবো অবশ্যই যদি বাই চান্স পেরে যাই।”

অনেক খুঁজতে খুঁজতে একটা কন্ট্রা এন্ট্রিতে কনফিউশন লাগছে। ওটা ক্রেডিটে যাওয়ার কথা। কিন্তু আর্সি জানে সে তো থিওরি পড়েইনি। যতটা শিখেছে তা এখানে এসেই।

স্মৃতি

খাতাটা এগিয়ে দিয়ে সে বলে “একটু দেখো তো এই এন্ট্রিটা কি ঠিক আছে?” শ্রেয়াংশ কিছুক্ষণ আর্সির দিকে তাকিয়ে থাকে। সত্যি তো, এতবার সে চেক করল তবু ধরতে পারেনি, আর এই মেয়েটা একবারেই...

“কী বলবো তোমায় তুমি সত্যি পারো।”

“ভুল বললে। চেষ্টা করি। আমি তো শিখছি। তুমি শিখে এসেছ।”

“এবার তো বুঝতে পারছি তোমার শেখা আর আমার শেখা।”

“মজা করছো? জানি না বলে আওয়াজ দিচ্ছ?”

“আরে না ভুল বুঝছো।” এভাবেও বেশ কিছুদিন। কিন্তু আমার যেন কোথায় মনে হতে লাগলো আমার না জানাটা নিয়ে সবাই মজা করছে পেছনে। একদিন ঠিক করলাম চাকরিটা ছেড়ে দেব। যা ভাবা তাই কাজ। সেদিন স্যালারির ডেট। বস কেবিনে ডেকে বললেন, “পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্টের কাজ করতে।”

সোজা না বলে দিলাম কারণ ততক্ষণে নিজের মনকে তৈরি করে ফেলেছি যে এই পরিবেশে কাজ করবো না। ছুটির সময় কাউকে কিছু না বললেও শ্রেয়াংশকে বললাম।

আজ শেষ দিন। আর কাজ করবো না। তোমরা ভালো থেকো। ওর মুখটা যেন শুকিয়ে গেল।

“আজ একটু বসে চা খেতে পারি?”

"হ্যাঁ।" চা আর কাটলেট নিয়ে দুজনে বসেছি টেবিলের দু-প্রান্তে মুখোমুখি।

"আচ্ছা আর্সি তুমি কেন চাকরিটা ছাড়ছো? আমি কি তোমায় কোনোভাবে হার্ট করেছি?"

"না তো।"

"তবে আমিও ছেড়ে দেব।"

"এ মা কেন?"

"আসলে তুমি না থাকলে আমার ও কাজে মন বসবে না।"

"আহা, সব জায়গায় কি আমি থাকব?"

"না। ভাবছি বি. এড. টা করে নেব। তুমি করবে?"

"আমরা দুজনে একসাথে যদি পড়ি?"

"এ তো খুব ভালো প্রস্তাব কিন্তু এখন এসব নিয়ে ভাবছি না।"

শ্রেয়াংশ আর চুপ না করে বলেই ফেললো "তাহলে কি আমাদের আর দেখা, কথা হবে না?"

"তা কেন? কথা হতেই পারে। দেখার গ্যারান্টি নেই।"

"এই তো ঝামেলা হয়ে গেল।"

"কিসের ঝামেলা?"

"এই যে অভ্যেস করে দিয়েছ তোমার সাথে রোজ যাওয়া, কথা বলা, কাজ করা।"

"ওসব ঠিক হয়ে যাবে। সময়ের মতো বড় ওষুধ আর কিছু নেই।"

স্মৃতি

বহু বছর পর একবার ট্রেনে দেখা। কিছুক্ষণ চুপ থাকা। তারপর কয়েকটা কথা। তারপর বিপরীত রাস্তায় আবার হেঁটে যাওয়া। মন দু'টোকে দুজনের কাছ থেকে টেনে নিয়ে চলে যাওয়া।

আর্সির বিয়ে হয়েছে দূরে। ইউ. এস. এ.-তে। এক ছেলে ওদের। অভাব নেই। তবু খুব মন খারাপের সময়টাতে এই স্মৃতিগুলো আঁকড়ে ধরে একটা অন্য ছবি আঁকে মনে মনে। হলেও তো হতে পারতো। শ্রেয়াংশ কি আজ ও তাই ভাবে? কি জানি হয়তো, হয়তো বা না। সে হয়তো এখন ছেলে স্ত্রীকে নিয়ে ডুবে আছে! কোথাও কি এসব স্মৃতি তার মনেও রাখা আছে?

জানে না আর্সি। তবে কখনো কখনো ফেসবুক খুললে মুখটা ভেসে ওঠে। খুব রোগা হয়ে গেছে। শরীরটা কি খারাপ? ভাবতে ইচ্ছে করে, বলতে ইচ্ছে করে একটু যত্ন নাও নিজের। কিন্তু ওই কিন্তুতেই বেঁচে থাকার রসদ খোঁজে আর্সি। এটা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। ■